একক ৩৫ ❐ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

গঠন ঃ

৩৫.০ উদ্দেশ্য
৩৫.১ প্রস্তাবনা
৩৫.২ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহের আবির্ভাব
৩৫.৩ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : বাংলা
৩৫.৪ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : অযোধ্যা
৩৫.৫ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : হায়দরাবাদ
৩৫.৬ অনুশীলনী
৩৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের গুরুত্ব কতখানি।
- মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলির উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল।
- ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত কিভাবে ঘটেছিল।

৩৫.১ প্রস্তাবনা

১৭০৭ সালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত অবস্থায় মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে ১৭৫৭ সালে বাংলার বুকে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পঞ্চাশ বছরকে ভারতের ইতিহাসে একটি কালিমালিপ্ত অন্ধকারময় যুগ বলেই চিহ্নিত করা হয়ে আসছিল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উইলিয়াম আরভিন (William Irvine) তাঁর Later Mughals গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ বিধ্বস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে আসীন একের পর এক শাসন-বিমুখ বিলাস-বিহ্বল, স্বার্থান্বেষী, পারস্পরিক বিভেদ জর্জরিত মুঘল অভিজাত সলম্প্রদায়ের দিভ্দংসী ষড়যন্ত্রের শিকার অকর্মণ্য মুঘল বাদশাহের অপটুতার ফলে সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবক্ষয় এবং অবশেষে ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত করেন। আচার্য যদুনাথও এই তত্ত্ব মেনে নেন যে, ভারতের গরিমাসূর্য মূঘল সাম্রাজ্যে অস্তমিত হয়ে পুনরাবির্ভূত হয় ইংরেজের জয়সূর্য হয়ে। মুঘল শাসনের পরেই ইংরেজ

শাসন সম্পূর্ণ নূতন একটি যুগের সূচনা করে বলে তাঁরা মনে করেন। কি সাম্রাজ্যবাদী, কি জাতীয়তবাদী সব ঐতিহাসিকই এই একটি বিষয়ে একমত যে, ইংরেজ রাজত্ব পূর্ববর্তী যুগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবেন যে ইংরেজ শাসন ভারতে এক নতুন দিগহন্ত উন্মোচন করেন। অন্ধ কুসংস্কার এবং স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে ইংরেজ রাজত্ব ভারতীয় ইতিহাসে এক আধুনিক, গঠনমূলক সভ্যতার সূচনা করে। সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী হয়েও কার্ল মার্কসও ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অতীত মুছে ফেলে দেশের সামগ্রিক আধুনিকীকরণের জন্যে ইংরেজ শাসনের ?অপরিহগার্য ভূমিকার কথা অস্বীকার করতে পারনেনি। জাতীয়তাবাদীরা আবার ইংরেজ শাসনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় ইংরেজ শাসন ভারতের অর্থসম্পদ লুন্ঠন করে, ভারতের বাণিজ্য এবং পুঁড়ি ধ্বংস করে, ভারতের সামরিক শক্তিকে সাম্রাজ্য গঠনের কাজে নিয়োগ করে এবং ভভারতীয় শ্রমিককে বিদেশী পুঁজির অধীন করে ভারতের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদীরা এই যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কথা বলেছেন আধুনিক ঐতিহাসিকরা আর সে তত্ত্ব মেনে নিতে পারছেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এরিক স্টোকস্ (Eric Stokes) এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্রগণ মুঘল সাসনের পতনের সময় থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত সময়টা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এই সময়েও ভারতের শাসনতান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই মুঘল শাসন থেকে ঔপনিবেশিক শাসন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বাদশাহী শাসনের শিথিলতার সুযোগে যে আঞ্চলিক শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই আঞ্চলিক আর্থ-রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাই ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকাঠামো গঠনে অনুসৃত হয়েছিল।

৩৫.২ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহের আবির্ভাব

মুঘল শাসনের শেষের দিকে দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় অর্থনৈতিক শ্লথতা। জাঠ, শিখ, মারাঠা—সব আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গা। ফারুখাবাদে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বঙ্গাস পাঠানরা। রোহিলখণ্ডে স্বাধীনতা ঘোষণা করে রোহিলা আফগানরা। মুঘল প্রাদেশিক শাসকগণও এই সুযোগে নিজ নিজ প্রদেশে বংশানুক্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদশাহী শাসনের পক্ষে এগুলি সমস্যা সৃষ্টি করলেও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাগুলি যে কোন আকস্মিক বিপর্যয়ের সূচনা করে তা নয়। বরং আঞ্চলিক শাসক, সরকারি কর্মচারী, সামরিক পদাধিকারী, বণিক ও মহাজনদের নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে গড়ে ওঠে ছোট ছোট অনেকগুলি শহর। শহরাঞ্চলের ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসী জীবনের চাহিদা মেটাতে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মূল্যবান খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কেন্দ্র। শহরের বণিক ও মহাজনদের কাছে অগ্রিম অর্থ নিয়ে গ্রামের সাহুকার ও মহাজন সেই অর্থ লগ্নি করেন নগরের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে। গ্রামের চাষী ও কারিগরদের কখনও প্রলুব্ধ করা হয় অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, কখনও তাদের অভাব-অনটনের সুযোগে ঋণজালে তাদের আবদ্ধ করে, কখনও বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। বণিকদের মারফত গ্রামীণ পণ্য এভাবে নগদ রাজস্বে

রূপান্তরিত হয়ে নতুন যুগের সামরিক আয়োজন ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান সুনিশ্চিত করে। সামরিক প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিদেশী ঘোড়ার ব্যবহার যত বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ততই অপরিহার্য হয়ে উঠতে থাকে। দেশের রাজনীতিতেও এর ফলে বণিক ও মহাজনগণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বণিক ও মহাজনগণ এই সময় থেকে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিতে শুরু করেন এবং শাসনতান্ত্রিক শ্লথতার সুযোগে উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যক্তিগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করে এই পুঁজি পুনরায় বাণিজ্যে নিয়োজিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ভারতের সামাজিক রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক আইনকানুন এই সময়ে ছিল ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী। সম্পত্তি ছিল সবসময়েই সমষ্টিগত বা সার্বজনীন। উচ্চশ্রেণীর কিছু মানুষ অনেক সময় দেবত্র বা ইনাম হিসাবে কিছু সম্পদ সমষ্টির নিয়ন্ত্রমের বাইরে রাখতেন এবং এর থেকে পুঁজি সৃষ্টি করে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করতেন। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ অইধকার দিত তাহলে সেটা হ'ত কোন সামরিক দায়িত্ব পালনের শর্তসাপেক্ষে। তাই রাজস্ব সংগ্রহকারী, মহাজন বা বণিকগণ স্থানীয় সাসনের দুর্বলতার সুযোগে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করলেও দেশের আইনে এর কোন সমর্থন ছিল না। এবং স্থানীয় শাসকও সুযোগ পেলেই তাঁদের এ ধরনের সম্পদ বৃদ্ধিতে বাধা দিতেন।

এই সময়কার ইউরোপীয় বণিকদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেও ছিল এই নগদ রাজস্বের চাহিদা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের চাহিদার ফল। স্পেনীয় আমেরিকায় প্রচুর রৌপ্য আবিষ্কৃত হবার পর ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে এই রৌপ্য ভারতে আসতে শুরু করে। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী বিদ্রোহ দমনের সামরিক প্রস্তুতির জন্য এই সময়ে বিপুল রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই নগদ রাজস্ব সংগ্রহের উপায় হিসেবে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া সম্ভব হয়। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক শাসকগণেরক কাছে ইউরোপীয়গণ নানারকম সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকেন। তাঁদের একদিকে যেমন শুল্কের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় অন্যদিকে তেমন তাঁদের ব্যবসায়িক নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হয়। ইউরোপীয় বণিকগণের সঙ্গে ভারতীয় বণিক ও মহাজনগণের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। ইউরোপীয় বণিকগণ প্রায়ই ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য ভারতীয় পুঁজির উপর নির্ভর করতেন। কোম্পানীর পণ্য সংগ্রহের জন্যও ভারতীয় দালাল ও পাইকারগণের সাহায্য ছাড়া তাঁদের চলত না। এভাবে ভারতীয় মহাজান ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিককুলের একটা স্বার্থের সাযুজ্য ও নির্ভরতা গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক শাসকের কোপ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার তাগিদে ভারতীয় বণিক ও মহাজন সমাজ ইউরোপীয়গণের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। পারস্পরিক আত্মরক্ষার তাগিদে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিককুল মিলিত আঘাত হানেন স্থানীয় শাসকের শক্তিতে। এভাবেই ঘটে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন। মুঘল শাসনব্যবস্থা, মুঘল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, মুঘল জমিদার, আমলা আর মহাজনকে নিয়েই স্থাপিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি। পরবর্তীকালে বিদেশী শক্তি ভারতীয় পুঁজির কণ্ঠরোধ করে ভারতীয় কারিগর ও কৃষককে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকারে পরিণত করলেও ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের এই পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল

মুঘল শাসনের ভগ্নাবশেষকে অবলম্বন করেই। ঔপনিবেশিক শাসন সে অর্থে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক আকস্মিকতার সূচনা করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন থেকে সরে আসা আঞ্চলিক শাসন কেন্দ্রগুলি মুঘল ও ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যে এক সেতুবন্ধনবিশেষ।

৩৫.৩ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : বাংলা

আঞ্চলিক শাসনের বিবর্তনের প্রথম সফল নিদর্শন ছিল মুঘল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত বাংলা প্রদেশ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যস্ততায় দাক্ষিণাত্যেই দরবার বসাতে থাকেন সেই সময় উত্তর ভারতে জাঠ, শিখ, সৎনামী, বুন্দেলা, রাজপুত প্রভৃতি গোষ্ঠীর জমিদাররা প্রায়ই বিদ্রোহ করা শুরু করেন এবং এর ফলে মুঘল রাজকোষে নিয়মিত রাজস্ব জমা পড়াও বিঘ্নিত হতে থাকে। সম্রাটের ব্যস্ততার সুযোগে দিল্লিতে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইরানী, তুরানী, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। আমীর-ওমরাহের এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় বিদ্রোহী জদমিদারদের দমন করার কাজেও তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে ঔরঙ্গজেব তাঁর এক সুযোগ্য কর্মচারীকে ১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মহম্মদ হাদি বা করতলব খান নামক এই কর্মচারী (পরবকর্তীকালে যিনি মুর্শিদকুলি খান নামে খ্যাত হন) ইতিপূর্বেই দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব আদায়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ তাঁকে সম্পদসমৃদ্ধ প্রদেশ বাংলার রাজস্ব আদায়ের কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।

এই সময়ে বাংলার সুবাদার ছিলেন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-আল-দিন বা আজিম-উস-সান। বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আজিম-উস-সান তাঁর পিতা শাহজাদা মুয়াজ্জমের প্রয়োজনের কথা ভেবে বাংলার রাজস্ব নিয়মিত সম্রাটকে পাঠাচ্ছিলেন না। সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলার রাজস্ব উদ্ধার করে সম্রাটকে নিয়মিত দাক্ষিণাত্যের দরবারে সেই রাজস্ব প্রেরণ করার জন্যেই মুর্শিদকুলি বাংলায় আসেন।

মুর্শিদকুলিকে বিপদে ফেলার জন্য সুবাদার আজিম-উস-সান একদিন রাজধানী ঢাকার রাজপথে আকস্মিকভাবে নগদি সৈন্যগণকে বকেয়া বেতনের দাবিতে মুর্শিদকুলিকে বিব্রত করতে পাঠান। তাঁর আশা ছিল যে সেই বাদবিতণ্ডার ফলে মুর্শিতগুলি সৈন্যদলের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাবেন। কিন্তু মুর্শিদগুলি সুকৌশলে এই চক্রান্ত এড়িয়ে প্রাণ বাঁচান। কিন্তু এর পরে তিনি বুঝতে পারেন যে ঢাকা শহরে তিনি নিরাপদ নন। অতএব তিনি দিওয়ানি ঢাকা থেকে সরিয়ে ভাগীরথীর কুলে মাকসুসাবাদ শহরে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে এই শহরের নাম তাঁর নিজের নাম অনুসারে হয় মুর্শিদাবাদ। সুবাদারের কোপ থেকে বাঁচার জন্য এই পন্থা উদ্ভাবন করলেও এই কাজের উপলক্ষ ছিল স্বয়ং ভাগীরথীর মোহনায় উপস্থিত থেকে ইউরোপীয় বণিকগণের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা।

এইভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সুবাদারের বিরোধিতার মোকাবিলা করার পর তিনি বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোযোগী হন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হয় সরকারি কাজ বাবদ প্রাপ্ত জায়গীরগুলি উর্বর

বাংলার বুক থেকে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর উড়িষ্যায় সরিয়ে দিয়ে জায়গীরদারের আয় সঙ্কোচন এবং খালসা বা রাষ্ট্রীয় জমির আয় বৃদ্ধি।

তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হয় বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতিটি কৃষকের চাষ করা জমির পরিমাণ এবং তার আয় নিরূপণ করা এবং সেই অনুসারে রাজস্ব দাবি করা। ১৫৮২ সালে টোডরমল বাংলার রাজস্বের যে পরিমাপ করেন তা ছিল অনেকটাই অনুমানভিত্তিক। পরবর্তীকালে ১৬৫৮ সালে শাহসুজা পুনরায় একটি নতুন বন্দোবস্ত করেন। ১৫৮২-র পরবর্তীকালে যে সকল জমিতে নতুন করে আবাদ হয় শাহসুজা তাঁর বন্দোবস্তে সে সবগুলিই অন্তর্ভুক্ত করেন। দেওয়ানি অধিগ্রহণের পরে এইসব রাজস্ব ব্যবস্থার উপর আস্থা না রেখে মুর্শিদকুলি দলে দলে আমিল, কারকুন এবং মুৎসুদ্দিকে পাঠান প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি রায়তের জমি জরিপ করে সেই সকল জমির উর্বরতা ইত্যাদির পরিমাপ করে একটি যথাসম্ভব ব্যস্তবানুগ জমা (রাজস্বের হার) নির্ধারণ করতে। এইসব কাজের সময় জমিদাররা যাতে বাধা না দিতে পারেন সেজন্য জদমিদারদের দেওয়ানের সভায় আহ্বান করা হয় এবং কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই আবদ্ধ করে রাখা হয়। এইভাবে জমি জরিপ করে যে নতুন রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় জমিদারকে সেই রাজস্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। জমিদার কোন কারণে এই রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলে অপর ব্যক্তির কাছে জামিন নিয়ে তাকে জনি **ইজারা** দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে সেইজন্য অনেক সময় **মাল জামিনি** ব্যবস্থা বলেও উল্লেখ করা হয়।

দেওয়ানের কর্মচারীরা সরাসরি রায়তের উৎপন্ন ফসলের মূল্য নিরূপণ করে রাজস্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনে জমিদারকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকেও ইজারা দিয়ে এই রাজস্ব সংগ্রহ করায় আচার্য যদুনাথ এই ব্যবস্থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দাক্ষিণাত্যে টমাস মানরো কর্তৃক প্রচলিত রায়তয়োরী ব্যবস্থার অনুরূপ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবদুল করিমের গবেষণায় জানা গেছে যে, মুর্শিদগুলির কর্মচারীগণ শুধু মাঝকুরি বা ছোট জমিদারের কাছে ইহতিমান বা বড় জমিদার কি খাজনা লাভ করতেন শুধু সেই সকল দলিলই পরীক্ষা করেছিলেন। ফলে মুর্শিদকুলির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রায়তওয়ারি বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়তো ঠিক নয়।

নির্ধারিত রাজস্ব নির্ধারিত দিনে আদায় করা সম্বন্ধে মুর্শিদকুলি খুবই সতর্ক ছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিন বা পুণ্যাহের মধ্যে খাজনা মিটিয়ে না দিলে তিনি জমিদারদের শারীরিক নিগ্রহ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। প্রায়ই জমিদাররা জমি বিক্রয় করে খাজনা মেটাতে বাধ্য হতেন। এই কারণেও আচার্য যদুনাথ মনে করেছিলেন যে, মুর্শিদকুলির ব্যবস্থায় জমিদারিপ্রথা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে, মুর্শিদকুলি ছোট জমিদারদের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না বলেই তাঁদের জমি হস্তন্তারিত হয়োতে বিচলিত ছিলেন না। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে অসংখ্য ছোট জমিদারের হাতে জমি না থেকে কয়েকটি সম্পদশালী বড় জমিদারের হাতে জমি গেলে রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তা থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যাবে। অসংক্য ছোট ছোট জমিদারকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসংখ্য কর্মচারী প্রয়োজন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় জমিদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুললে তাঁরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করবেন। এছাড়া তাঁদের পক্ষে বড় মহাজনের কাছে ঋণ

পাওয়াও সহজ। তাই তাঁদের পক্ষে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান অপেক্ষাকৃত কম দুরূহ। মুর্শিদকুলির আমলে কিছু ছোট জমিদারের জমি চলে গেলেও এই সময়ে বেশ কয়েকটি বড় জমিদারের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। নদীয়া রাজের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। বর্ধমান রাজের আয়তন বৃদ্ধি পায় শতাব্দীর শেষে। রাজশাহী ও দিনাজপুরের বাড়-বাড়ন্ত ঠিক কেবারে মুর্শিদগুলির শাসনের শুরুতে। এ সময়কার শতকরা ৬০ ভাগ রাজস্বের উৎস ছিল বর্ধমান ও রাজশাহী-রাজ। বিহারে শাহাবাদ, তিরুহুত ও টিকারির জমিদারগণও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন.। কাজেই মুর্শিদকুলির বন্দোবসত্রে ফলে জমিদারি প্রথা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন বলা যায় না।

দিওয়ানির আয় বাড়াবার জন্য মুর্শিদকুলি আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত জায়গীরদারের জায়গীর বাংলার উর্বর জমি থেকে সরিয়ে অনুর্বর উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। এর ফলে খালসা বা সরকারের অধিকৃত জমির আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

এইসব নানারকম কৌশলের দ্বারা মুর্শিদকুলি বাংলা প্রদেশের আয় প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করেন এবং নিয়মিত এই অর্থ সিক্কা টাকা বা রৌপ্যমুদ্রায় বাদশাহের কাছে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে থাকেন। এর ফলে সম্রাট মুর্শিদকুলিকে নানাভাবে সমর্থন ও সহায়তা করতে থাকেন। মুর্শিদদকুলির পক্ষেও বাদশাহের পৌত্র আজিম-উস-সানের বিরোধিতা সত্ত্বেও সফলভাবে দিওয়ানির দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। ১৭০০ সালে তিনি যখন বাংলা ও উড়িষ্যায় দিওয়ান হয়ে যোগ দিতে আসেন তখন মাকসুসাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং কটকের ফৌজদারিও ছিল তাঁর দখলে। ১৭০৩ সালে তিনি উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৪ সালে তাঁকে বিহারের দেওয়ানিরও ভার দেওয়া হয়।

১৭০৭ সালে আজিম-উস-শানের পিতা উত্তরাধিকার যুদ্ধে জয়লাভ করে বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে বাদশাহ হলে আজিম-উস-সান মুর্শিদকুলিকে ১৭০৮ সালে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত করে বাংলা থেকে সরিয়ে দেন। তাঁর পরবর্তী **দেওয়ান** দিয়া-আল-দিন খান **নগাদি** সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারালে আবার ১৭১০ সালে মুর্শিদগুলিকে বাংলার **দিওয়ান** পদে ফিরিয়ে আনা হয়।

১৭১২ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধের শেষে সম্রাট হন জাহান্দার শাহ। আজিম উদ্দিনের পুত্র ফারুখশিয়র এই সময় বাংলার রাজস্বের সাহায্যে সিংহাসন দখল করা মনস্থ করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি তাকে বাংলার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। পরে ১৭১৩ সালে ফারুকশিয়র সম্রাট হলে তিনি মুর্শিদগুলিকেই বাংলার দিওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার পদে বহাল রাখেন। ফারুকশিয়নেরর শিশুপুত্র এবং পরে আরোক ওমরাহ মীর জুমলা নামেমাত্র বাংলার সুবাদার হন এবং মুর্শিতদরককুলি এ সময় নায়েব সুবাদার হিসেবে সবরকম ক্ষমতা উপভোগ করতে থাকেন। ১৭১৫-১৬ সালে মীর জুমলা বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে না পাঠিয়ে স্বয়ং আত্মসাৎ করলে ফারুকশিয়র মুর্শিদকুলিকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ নিশ্চিতরূপে ১৭১৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া ফরমান জারি করার আগেই হয়েছিল কারণ ফরমানটি ছিল জাফর খান বা মুর্শিদকুলির উদ্দেশ্যে লিখিত।

নিয়মিত দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণের ফলেই মুর্শিদকুলি সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন

এবং বাংলার দিওয়ান পদ থেকে ক্রমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের সুবাদার হয়ে ওঠেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের এতটাই আস্থাভাজন ছিলেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর সহকারী (নায়েব) নিযুকত্ত করার সুযোগ দেন। ১৭১৩ সালে তিনি নায়েবহ সুবাদার পদে উন্নীত হলে আক্রম খানকে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করেন। স্বয়ং সুবাদার হবার পর তিনি আক্রম খানকে দেওয়ান পদে উন্নীত করেন। আক্রম খাঁ মারা গেলে সৈয়দ রাদি খাঁ এবং তারপর পৌত্র সরফরাজ খান দেওয়ান নিযুক্ত হন। বালেশ্বর ও ভূষণার ফৌজদারও ছিলেন তাঁর আত্মীয়। মাকসুসাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং কটকের ফৌজদারি তিনি স্বয়ং হস্তগত করেন।

মুর্শিকুলির প্রতিপত্তির উৎস ছিল তাঁর রাজস্ব আদায়ে সাফল্য এবং নিয়মিত সেই রাজস্ব দিল্লিতে প্রেরণ করা। নির্ধারিত মানের সিক্কা বা রৌপ্যমুদ্রায় রূপান্তরিত করেই তিনি রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন। জগৎশেঠ পরিবারের সহায়তার ফলেই তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে এই পরিবার প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। বড় জদমিদারদের খাজনা নিয়মিত প্রদার করার দায়িত্ব নিয়েও জগৎশেঠ বাংলার জমি থেকে উদভূত আয়ের এক অংশের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলার দেওয়ান, সুবাদার এমনকি মোগল বাদশাহকেও ঋণপ্রদান করেন। এই কারণেই সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁকে ১৭২৩ সালে জগৎশেঠ খেতাব প্রদান করেন।

জগৎশেঠ এইভাবে মুঘল দরবারেও যথেষ্ট প্রভাব অর্জন করেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী পৌত্র সরফরাজ খানের পরিবর্তে জামাতা সুজাউদ্দিন জগৎশেঠের সহায়তাতেই মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে বাংলার সুবাদিারির জন্য ফরমান লাভ করেন। আবার বিহারের নায়েব সুবাদার আলিবদর্দি খান ১৭৩৯ সালে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর জগৎশেঠের সহায়তাতেই সরফরাজ খানকে অপসারণ করে বাংলার নবাবিতে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলিবর্দি খান বাদশাহের ফরমানের জন্য দিল্লিতে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করলেও অধস্তন কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি দিল্লির মতামতের অপেক্ষা না রেখে নিজেই পাটনা, কটক ও ঢাকার জন্য নায়েব নিয়োগ করেন। এইসব পদে তিনি সাধারণত নিকট আত্মীয়দেরই নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের শাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য থাকতেন হিন্দু দেওয়ানরা।

১৭৪০ সাল নাগাদ বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ মিলে একটি স্বতন্ত্র নবাবী গঠিত হয়। বিহারে থাকার সময় আলিবর্দি একটি নিজস্ব পাঠান ফৌজ গঠন করেন। তিনি বাংলায় এই ফৌজ নিয়ে আসেন। এই সময় থেকেই উত্তর ভারতীয় সিপাহী ও অশ্বাররোহীদের নিয়ে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে পাঠানোর রেওয়াজও কমতে থাকে। মুর্শিদকুলির আমলেই বাংলাতে মুঘল কর্মচারীদের জায়গীর এবং সিপাহীদের ভরণপোষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব জায়গীর হিসেবে বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তা ছিল শাসন ব্যয় এবং নবাবের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য। বিহার এবং উড়িষ্যায় যে সব জায়গীর ছিল সেগুলি শেষপর্যন্ত

সম্রাটের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ওঠে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ মারাঠা আক্রমণের সময় দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এভাবেই বাংলা ক্রমশ দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

৩৫.৪ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : অযোধ্যা

আগ্রার প্রদেশের প্রান্তে এলাহাবাদ সুবা পর্যন্ত আধুমিক উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল মুঘলদের অযোধ্যা (Awadh) সুবার অন্তর্গত। এর উত্তর ছিল নেপালী তরাই-এর ঘন জঙ্গাল। এই অঞ্চলে ছিল বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর জমিদারদের বসবাস। বৈশ, কানপুরিয়া, বিশেণ, বাচগোটি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর জমিদারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এখানকার জমিজমার দখল। রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ জমিদাররা অধিকাংশ সময় মুঘল শাসকের সঙ্গে এবং নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মত্ত থাকতেন। চাষবাসের কাজ ছিল ভর, পাসি, কুর্মি প্রভৃতি নিম্নজাতীয় সম্প্রদায়ের হাতে। মুঘল রাজস্ব আদায়কারীর সঙ্গে রাজস্ব প্রদান নিয়ে মতান্তর হলে তৎক্ষণাৎ এই জমিদাররা তাঁদের কৃষকবাহিনীকে নিয়ে গভীর বনে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এবং প্রয়োজনে বৎসরাধিককাল জঙ্গালেই বসবাস করে কখনও লুঠতরাজ কখনো বা বনের মধ্যেই চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যতদিন না মুঘল শাসক তাঁদের চাহিদামত রাজস্বের হার মেনে না নিতেন ততদিন এই অবস্থাই চলত। তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসন কার্যকরী করতে গিয়ে সুবাদারের হাতে জমিদার ও কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত অপরিমিত ক্ষমতা তুলে দিতে হত। অযোধ্যার সুবাদার স্থানীয় জমিদার গোষ্ঠীগুলিকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে সুসংবদ্ধ করতে সমর্থ বলেই নবাবি শাসন সুদৃঢ় হয়। সুবাদারের পদটি এইভাবে বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং প্রদেশগুলি সুবাদারের স্বদেশ বা সুবা-ই-মুলকি এবং দার-উল-মুল্ক নামে পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবাগুলি সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতীকবাহী হয়ে চলে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসকের পক্ষে মুঘল কেন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতাশালী নতুন সুবাদারগণ মুঘল দরবারে কোন না কোন দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই চলতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ পরিস্থিতিতে যেখানে অনেক ভাগ্যান্বেষীর নিরন্তর সংগ্রা চলেছিল সেখানে কোন বিশেষ, অধিকারের স্বীকৃতি পেতে সর্বদা কোন উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন ছিল। মুঘলদের চাইতে স্বীকৃতি দেবার যোগ্যতার কোন শক্তির তখনও উদ্ভব হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় শক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়লেও স্বীকৃতির প্রতীকরূপে মুঘলদের প্রয়োজদন থেকেই গিয়েছিল।

মুঘল শাসননীতির সুপ্রাচীন রীতি অনুসারে সুবাদারের ক্ষমতা ছিল সীমিত। দিওয়ান এবং বক্সি নিয়ন্ত্রণ করতেন জায়গির, খালসা এবং দাগ ও অসিহা অর্থাৎ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়। দিওয়ান এবং বক্সি আবার দায়িত্ববন্ধ ছিলেন কেন্দ্রে দিওয়ান-ই-আলা বা উজীর বএবং মীর বক্সির কাছে। ফৌজদগার, ওয়াকাইনগর, আলিসল দিওয়ান এঁরা কেউই সুবাদারের অধীন ছিলেন না এবং প্রাদেশিক স্তরে এঁদের উপস্থিতির ফলে সুবাদারের ক্ষমতা হয়ে পড়ে সীমিত। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ প্রাদেশিক শাসকের হাতে সামরিক, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তুলে দিয়েছিলেন কারণ তিনি

এইসব ব্যক্তিকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিয়ে চেয়েছিলেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় দলাদলি প্রাদেশিক স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে।

১৭০৭ সালের নভেম্বর মাসে অযোধ্যার শাসক হন চিন-কিলিক-খান। এই প্রদেশের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি এবং তার সঙ্গে এলাহাবাদের নিকটস্থ জৌনপুরের ফৌজদারিও তিনি হস্তগত করেছিলেন। তাঁর ৭০০০ জাত/৭০০০ সওয়ার মর্যাদার মনসবের দাবি মঞ্জুর না হওয়ায় ১৭০৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি প্রতিবাদস্বরূপ সুবাদারি ত্যাগ করেন। উজির মুনিম খান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় ফৌজদারিগুলি সমেত ৭০০০/৭০০০০ মনসবাদর হয়ে অযোধ্যায় সুবাদারিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জৌনপুরের ফৌজদারি নিযুক্ত হন তাঁরই পিতৃব্য কিলিচ-মহম্মদ-খান। মুঘল রাজদরবারে তাঁর বিশেষ-প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে চিন-কিলিচ-খান এই সম্মান লাভ করেন। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও এর কিছুদিনের মধ্যেই চিন-কিলিচ-খানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দজুলফিকার খানের একজন খনিষ্ঠ ব্যক্তি ভরাইচেত ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং এই পদের ডন্য চিন-কিলিচ-খান বাদশাহের কাছে যে নাম সুপারিশ করেন তা প্রত্যাখ্যাত হয়। রাজপুতগণের সঙ্গে বোঝাপড়া করা নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে মতান্তর হলে তাঁকে লক্ষ্ণৌ এবং খয়রাবাদের ফৌজদারীও দিওয়ানকে দিয়ে দিতে হয়। এই দিওয়ানও ছিলেন জুলিফিতকার খানের ঘনিষ্ট এবং চিন-কিলিচ-খানকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি সহায়তা করতেন। চিন-কিলিচ খান যে সব সুযোগ-সুবিধা পেতেন তা কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি তাই তাঁর উত্তরসুরীরা কেউই তাঁর সমান সুযোগ পাননি।

চিনি-কিলিচ-খান ইস্তফা দিলে তাঁর ভাই মহম্মদ আমিন খানকে কিছুদিন সুবাদার নিয়োগ করা হয়। এরপর মীল মুশারফ নামে একজন মহিলাবাদের আফগান সুবাদার পদ লাভ করেন। পরবর্তী সুবাদার কিলিচ মহম্মদ খান এবং সরবুলান্দ খান একসঙ্গে অনেকগুলি ফৌজদারির ননয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দরী প্রথম দিকে সুবাদারের ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে দজরবারি রাজনীতির গতি থেকে প্রাদেশিক রাজনীতিকে স্বতন্ত্র করে দেখলে চলবে না। এই দুটি স্তরের ঘটনাবলী ছিল পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সরবুলান্দ খানের পর সুবাদার হন ছবেলরাম। এঁরা দুজনেই ছিলেন ফারুকশিয়রের ঘনিষ্ঠ এবং এই কারণে এণদের নানা অতিরিক্ত ক্ষমতাও ছিল। সরবুলান্দ খান ছিনেল অযোধ্যার শেখজাদাদের ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর পক্ষে এই শেখজাদাদের সাহায্যে জমিদার বিদ্রোহ দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু মদদ-ই-মাসভোগী শেখজাদাদের অনেকরকম সুবিধা দিয়েও সরবুলান্দ খান সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

ছবেলরামের সঙ্গে ভরাইচের ফৌজদার হয়ে এসেছিলেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র গিরধর বাহাদুর। ছবেলরাম বাদশাহের লোক হওয়ায় উদজীর ছিলেন তাঁর পরম শত্রু। উদজীরের উদ্দেশ্য ছিল ছবেলরামকে দরবার থেকে দূরে রাখা। তাই ছবেলরামকে প্রাদেশিক স্তরে ব্যস্ত রাখার জন্য তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ছবেলরামের আরোক আত্মীয় আনন্দরাম ব্রহ্মাকে দেওয়া হয় প্রাদেশিক দেওয়ান পদ। এইভাবে সুবাদারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়তে থাকে।

ছবেলরাম জমিদার দমনের জন্য একাধিক অভিযান চালান। প্রদেশ শাসনের স্থায়িত্ব আনার জন্য তিনি আরো কয়েকটি ফৌজদারী নিজের অধীনে আনেন। অযোধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলাহাবাদ সুবারও দায়িত্ব চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ১৭১৫ সালে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়।

ছবেলরামের পরে সুবাদার হন মুজাফ্ফর আলি খান এবং জাগীর এলাকার ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব আদায় নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে তাঁর প্রবল বিরোধ বাধে। দিওয়ানের নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্মৌ-এর ফৌজদারি থাকায় দিওয়ান সেখানকার কোতোয়াল নিয়োগ করেন, কিন্তু সাবাদার তাতে বাধা দেন। এ নিয়েও বিরোধ বাধে।

এ সময়ে উজীর ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ খান। তিনি এই বিরোধ উভয়পক্ষেরই দাবি নাকচ করে কেন্দ্রীয় দেওয়ানকে লক্ষ্ণৌর কোতোয়াল নিয়ে.াগের দায়িত্ব দেন। এর পরের সুবাদার সাহাবাদের আফগান আজিজ খান চাঘতার সময়ে দেওয়ানকে নায়েব সুবাদার পদে উন্নীত করে সুবাদারের শক্তি খর্ব করার একটা চেষ্টা চলে। সৈয়দ ভ্রাতৃত্বয় এরপর কিছুদিন সুবাদার পদে নিজের লোক বাসাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষকালে এলাহাবাদের সুবাদার ছবেলরাম এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরধর বাহাদুর বিদরোহ করে অযোধ্যার সুবাদারি আদায় করেন এবং সেই সঙ্গে দেওয়ানি ও প্রদেশের সব ফৌজদারিগুলিও তাঁদের করায়ত্ত হয়। এভাবেই অযোধ্যায় নতুন সাবুদারির সূচনা হয়।

অযোধ্যায় খালিসা জমি বাড়াবার কোন চেষ্টা হয়নি। খালিসা থেকে আদায়ীকৃত খাজনা ছিল সমগ্র প্রদেশের শতকরা মাত্র তিন ভাগ। সুবাদার বরং খালিসা জমির পরিমাণ কমাতেই আগ্রহী ছিলেন কারণ খালিসা জদমি শাসনের ভার ছিল করোরি বা শেখজাদাদের হাতে। এই শেখজাদারা সুবাদার ও ফৌজদারদের সর্বদা অগ্রাহ্য করতেন। বৈশ্বারা জেলার ফৌজদার রদ আন্দাজ খান কারোরিগণ দ্বারা স্থানীয় শাসন দুরূহ করে তোলার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

মুঘল সুবাদারগণের অযোধ্যা শাসনের একটি প্রধান অন্তরায় ছিল সেখানকার উপর্যুপরি জমিদার বিদ্রোহ। এই জমিদারেরা ছিলেন অধিকাংশই রাজপুত, কয়েকজন মুসলমান যার মধ্যে আফগানরাে ছিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণ আর কয়েকজন অন্য জাতিভুক্ত। বৈশ্বরারার জমিদাররা, পরগনা সর্দপুর, লহরপুর, সান্ডির গৌররা এবং ইব্রাহিমাবাদের কানপুরিয়ারা ছিলেন মুঘল শাসনের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। মুঘল সৈন্য আক্রমণকালে জমিদাররা জঙ্গালে চলে যেতেন এবং কৃষকরা সম্পূর্ণ এঁদের বশীভূত ছিলেন। অনেক সময়ে জমিদাররা তাঁদের কর্তৃত্বের সুযোগে ছোট চাষীর (reza ri'aya) কাছে এবং রাজস্ব আদায়কারীদের কাছে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। বড় জমিদারদের দ্বারা ছোট জমিদারদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনাও অশ্রুতপূর্ব ছিল না। খেরি ও লহরপুরের গৌর জমিদার খয়রাবাদের সব জমিদারদের রাজস্ব আত্মসাৎ করেন। ১৭২১ সালে গিরধর বাহাদুর যখন গৌর জমিদারদের দমন করতে অগ্রসর হন তখন বহু ছোট জমিদার তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন।

খয়রাবাদ আর লক্ষ্ণৌ সরকারের অন্তর্গত বৈশ্বারা অঞ্চলে বৈশ এবং অন্যান্য জমিদারদের বিদ্রোহ আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে। বৈশ রাজপুতগণ এই অঞ্চলের বারোটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা সম্পূর্ণ এলাকাটিই দখল করতে শুরু করে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বসতিও গড়ে

ওঠে—যেমন আজগাঁ, মুর্তাজনগর, হুসেন নগর, গফর নগর, দোণ্ডিয়া খেরা, জগৎপুর এবং শকরপুর। হুসেন নগরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে একবার আফগানরা খৈরাবাদ-লক্ষ্ণৌ থেকে ফারুকাবাদ বিঠুরে যাবার রাস্তা আক্রমণও করে। এছাড়া পূর্বে বারাণসী থেকে পশ্চিমে বেরিলি, মোরাদাবাদ সম্বলে যাবার রাস্তাও ছিল। এছাড়া সাই নদীর ওপর ১৭৪০-এর দশকে একটি সেতুও নির্মাণ করা হয়। খৈরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দলমৌকে যুক্ত করে গঙ্গার অপরপারে খাজুয়া এবং বিন্দকি পর্যন্ত রাস্তা ছিল। এই রাস্তা যে সব অঞ্চল দিয়ে এগিয়েছিল সেই সব অঞ্চলের দখল নিয়েও বৈশ এবং কানুপরিয়াররা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন এত উন্নতমানের ছিল যে এখানে অনেক নতুন কসবা (শহর) গড়ে ওঠে। এই সময়ে এখানকার রাজস্বও শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এর কিছুটা হয়তো ছিল রৌপ্য আমদানির ফলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য। তবে উৎপাদনও নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সমপ্দ বৃদ্ধির ফলে দজদজমিদারগণ কেল্লা বা দুর্গ পড়তে থাকেন এবং আত্মীয়স্বজন ও ভাড়াটে সৈন্যের বাহিনী গঠন শুরু করেন। এসব ক্ষেত্রে স্বীয় গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট জমিদারগণই দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের বিরোধিতা করতে পারতেন। অনেক সময় একটি প্রধান গোষ্ঠীর জমিদাররার একটি বিশেষ এলাকা নিজেদের অধীনে আনতে গিয়ে শুধু যে মুঘলদেরই বিরুদ্ধতা করতেন তা নয়, অন্যান্য ছোট ছোট গোষ্ঠীর জমিদারদেরও দমন করে তাঁরা এলাকা সম্পূর্ণ নিজ গোষ্ঠীর আয়ত্তে আনতেন। মুঘলরা অনেক সময় বাইরে থেকে অন্য গোষ্ঠীর জমিদারগণকে বসতির জন্য আহ্বান করে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আধিপত্য দমনের চেষ্টা করতেন।

অনেক সময় মুঘলদের এক-একটি শাসনতান্ত্রিক ভাগে এক-একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যেত। কিন্তু মুদ্রার প্রচলন এবং জমি-জমার বিক্রয় শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই একটি পরগনায় মাত্র একটি জমিদার গোষ্ঠীর বসবাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ভরাইচ, হুসামপুর এবং মল্লানওয়ানে নতুন জমিদারি ক্রয় করেই এখানকার জমিদাররা প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রায়কোয়ার, বিশেষ এবং বৈশ জমিদারদের শক্ত ঘাঁটিতে এইসব নতুন জমিদারদের আনা হয়। উজাও পরগনায় বৈশদের শক্ত ঘাঁটিতে আনা হয় সৈয়দ জমিদারদের। এই পরগনায় সৈয়দদের কিছু আত্মীয়রা ছিলেন এবং এককালে এই অঞ্চলে তাঁদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। রদ আন্দাজজ খান এই অঞ্চলে তাঁদের পরিচিতি এবং তাঁদের আনুগত্যের জন্য তাদের এখানে প্রতিষ্টা করেন। হরহা পরগনায় বৈশ অধ্যুষিত অঞ্চলে গেহলট এবং চান্দেলরাও ঔরঙ্গজেবের কাছে জমিদারি পেয়েছিলেন। মুঘল শাসকের প্রতিনিধিরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদেই এত বিব্রত ছিলেন যে এভাবে বিদ্রোহী এলাকায় বহিরাগত জমিদারদের প্রতিষ্টা করার কাজে তাঁরা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। বরং এ প্রচেষ্টা স্থানীয় কৃষকশ্রেণীকে আরো বেশি করে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রণোদিত করে।

এই জমিদার বিদ্রোহের ফলে জায়গীরদারদের পক্ষে তাঁদের প্রাপ্য আদায় ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়ে। এর ফলে কয়েকটি নতুন প্রথার উদ্ভব হয়। একটি হল জাগীর-ই-সহল-ই-ওয়াতান বা জায়গীরদারের নিজস্ব এলাকার নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত জায়গীর। এই জায়গীরের অন্তত কিছু অংশ হত জায়গীরদারের নিজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। ফারুকশিয়ারের আমল থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে।

ক্রমাগত জমিদার বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন করা হয়। মনে করা হয় যে, স্থানীয় কোন শক্তিশালী জমিদারগোষ্ঠীর সদস্য হলে জায়গীরদারের পক্ষে তাঁর বিরাদরির অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করা এবং নিজের প্রাপ্য আদায় করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হবে। যতদিন মুঘল শাসন শক্তিশালী ছিল ততদিন ফৌজদার, সংবাদ লেখক, চৌধুরী ও কানুনগোদের দ্বারা জায়গীরদাররা নিয়ন্ত্রি হতেন। কিন্তু মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে যাবার ফলে জায়গীরদারদের উপর থেকে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এবং জায়গীরদার চাষীদের শোষণ করতে থাকে। এর ফলে চাষীরাও বিদ্রোহী জমিদারদের পক্ষ নেয়। এ অবস্থায় জমিদারকে জায়গীরদারি দিলে চাষীরাও অত্যাচার এবং শোষণ থেকে কিছুটা রেহাই পেত এবং জায়গীরদারও স্থানীয় প্রভাবের সাহায্যে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করতে পারতেন।

ওয়াতন জায়গীর দেবার সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদারদের স্থানান্তরিত করার প্রথাও প্রায় লুপ্ত হয় এবহং জায়গীরদাররা প্রায় চিরস্থায়ীভাবে জায়গীর উপভোগ করতে থাকেন। সাধারণ জায়গীরের ক্ষেত্রেও ক্রমে এই প্রথা স্বীকৃত হতে থাকে।

অযোধ্যায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় সাদাৎ খানকে। সৈয়দ ভ্রাতা হুসেন আলি খানকে হত্যা করে তিনি বাদশাহ মহম্মদ শাহের কৃতজ্ঞতাভাজন হন এবং ১৭২২ সালে অযোধ্যার কানপুরিয়া রাজা তিলোইরাজকে দমন করার জন্য এবং এই প্রদেশের রাজস্ব প্রচুর বৃদ্ধি করার জন্য তাঁকে বুরহান-উল-মুল্ক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাজধানীর দলাদলিতে কিছু কোণঠাসা হয়ে পড়ায় তিনি অযোধ্যার প্রতি মনোযোগী হন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদরজংকে তিনি নায়েব সুবাদার নিয়োগ করেন এবং বিদ্রোহী জমিদার দমনে অগ্রসর হন। তিনি তিলোকচাঁদি বৈশ, গোণ্ডার, বিশেন, বলরামপুরের জনওয়ারদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠান। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি চন্দেলা রাজপুত হিন্দু সিযসংকে দমন করেন। এর ফলে অযোধ্যার সীমানা পশ্চিমে কনৌজ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরপর তিনি দমন করেন গজিপুর ও অসোহর-এর জমিদার ভগবান সিং খিচরকে। এই জমিদার অনেকগুলি মুঘল সেনাপতিকে বধন করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে মুঘলদের বিরোধিতা করে চলছিলেন। এই উপলক্ষে সাদাত খান কোরা জাহানাবাদের ফৌজদারি আদায় করেন এবং এলাহবাবাদের একাংশ দখল করার সুযোগ পান। ইজারার মাধ্যমে তিনি বেনারস, জৌনপুর, গাজিপুর ও চুনারগড়ের বিশাল সরকারগুলি হস্তগত করেন। এর ফলে তাঁর কর্তৃত্ব মুঘলদের অযোধ্যা সুবার বাইরেও বিস্তৃত হয়।

নতুন অধিকৃত এলাকায় সাদাৎ খান নিয়মমাফিক শাসনব্যবস্থা বহাল করেন। এ সময়কার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল অযোধ্যায় মুঘল দেওয়ানের পদের অবলুপ্তি। সাদাৎ খান এই পদে নিযুক্ত করেন তাঁর অনুগত পাঞ্জাবী ক্ষত্রি আত্মারামকে। এই সময় থেকেই দেওয়ানি মুঘলদের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু সমসাময়িক বিবরণে মুঘল রাজকোষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ বা কোন রাজস্ব প্রদানের কথা জানা যায় না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থপ্রধান বা বাদশাহের দিওয়ানের কাছে রাজস্ব আদায়ের নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ ১৭২০-র দশকের মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৭ সালে সাদাৎ খান দিল্লি এবং দোয়াবের উপরিভাগ থেকে মারাঠা আক্রমণকারীগণকে বিতাড়িত করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এর পরেই মারাঠাগণ গঙ্গার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আক্রমণ শুরু করবে। দিল্লির দরবারে মারাঠা আক্রমণের কথা বলে তিনি আগ্রা, মালব, গুজরাট, বিহার এবং আজমীরের সুবাদারি দাবি করেন। দিল্লি রাজি না হওয়ায় সাদাৎ খান অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

উত্তর-পশ্চিম থেকে আক্রান্ত হয়ে বাদশাহ সাহায্য চাইলে সাদাৎ খান ৩০,০০০ অশ্বারোঙী এবং বন্দুক নিয়ে কর্ণালে মুঘল শিবিরে এসে উপস্থিত হন। মুঘল সৈন্যের শতকরা ৪০ ভাগ ছিল তাঁরই সেনানী। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে তিনি পারস্যদেশীয় সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। বাদশাহ, নিজাম ও সাদাৎ খান যখন পারসীয়দের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন সংবাদে জানা যায় যে নিজাম মীর বক্সি পদলাভ করেছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে সাদাৎ খান নাদির শাহকে আরো অনেক বেশি মুক্তিমূল্য দাবি করার পরামর্শ দেন এবং নিজের সেনাদলসহ পারসীয় শিবিরে যোগদান করেন।

সাদাৎ খান ভেবেছিলেন যে, নাদির শাহের সঙ্গে যোগ দিলে দিল্লি দখল শান্তিপূর্ণভাবে হবে এবং তিনি চলে গেলে দিল্লি দরবারে প্রয়োজনমত পরিবর্তন ঘটানো যাবে। কিন্তু নাদির শাহ যেহবাবে আর্থিক দাবি বাড়াতে থাকেন তাতে সাদাৎ খানের পক্ষে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কোন বিকল্প থাকে না।

মৃত্যুর সময়ে সাদাৎ খান অযোধ্যাকে একটি সাধারণ সুবাদারির পর্যায়ভুক্ত করে যাননি। অযোধ্যা এই সময়ে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির রূপ নেয় এবং স্বায়ত্তশাসনের পথে পা বাড়ায়। তিনি কোন সময় মুঘল রাজকোষে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন তার সঠিক সময় না জানা গেলেও জানা যায় যে মহম্মদ শাহ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তাঁকে সম্মানতি করেন। অবশ্য এর পরে তাঁর বিপুল সামরিক ব্যয় এবং মৃত্যুর পর ফেলে যাওয়া ঐশ্বর্য দেখে মনে হয় যে তিনি তাঁর আর্থিক দায়িত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সাদাৎ খান তাঁর প্রদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলেই ভাবতেন। তিনি কোন রাজধানী নির্মাণ করেননি এবং অযোধ্যার পশ্চিমে তাঁর সেনাশিবিরের সংলগ্ন এলাকায় কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষুপ্ত সৌধে ছিল তাঁর আবাস। ১৭৩০ সাল পর্যন্ত তিনি অযোধ্যাকে স্থায়ী আবাস বলেও ভাবেননি। অযোধ্যায় তিনি যেতেন বাদশাহের আদেশ পালনে, কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মুঘল দরবারি রাজনীতিরই এক শরিক।

দিল্লি ছেড়ে চলে যাবার আগে এক বিপুল পরিমাণ পেশকাশের বিনিময়ে নাদির শাহ বাদশাহ মহম্মদ শাহের দ্বারা সফদর জঙের সুবাদার পদে নিয়োগ অনুমোদন করিয়ে যান। সফদর জং (যুদ্ধে সিংহের মত) এই খেতাবটিও তিনি একই সঙ্গে লাভ করেন।

সাদাৎ খানের মত করেই সাম্রাজ্যের স্বার্থের অজুহাতে তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্বীয় শক্তি বিস্তারে সচেষ্ট হন। বাংলাদদেশের প্রাদেশিক শাসক আলিবর্দি খানকে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্থের আক্রমণ থেকে বাঁচাবর অজুহাতে তিনি মহম্মদ শাহরে কাছে রোহতাস ও চুনার দুর্গ দাবি করেন। শেষপর্যন্ত বাংলায় তংআকে যেতেও হয়নি এবং পাটনার ওমারাহরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানালে আলিবর্দি বাদশাহের কাছে সফদর জং-এর সাহায্য প্রত্যাহারের জন্য আর্জি জানান।

এই সময়ে উজীর কামারউদ্দিন খান তেমন শক্ত লোক ছিলেন না। ১৭৪৩ সালে নিজামও দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে সফদল জদং মীর অতীশ এবং কাশ্মীরের সুবাদার নিযুক্ত হন।

সাম্রাজ্যের নামে নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি সুযোগ আসে সফদর জঙের কাছে ১৭৪৮ সালে সম্রাট মহম্মদ শাহ এবং নিজাম-উল-মুল্ক উভয়ের মৃত্যুর পর দুর্বলতম বাদশাহ মহম্মদ শাহের আমলে। এই সময়ে সফদর জং উদজীর পদ লাভ করে। এই সময়ে তিনি এলাহাবাদের সুবাদিারিও হস্তগত করেন এবং অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী এই প্রদেশে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করেন। বাদশাহ আহমদ শাহ তাঁর পুত্রকে সুজাউদেদৌলাহ খেতাব দেন এবং মুঘল বন্দুকধারী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রও তাঁর হাতে তুলে দেন।

উজীর পদের পুরোপুরি সুবিধা পাবার পথে সফদর জঙের বহু প্রতিবন্ধক ছিল। দরবারে আরো নানা প্রতিদ্বন্দ্বীকে এড়িয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি সম্রাচেটর আনুকুল্যে ফারুখাবাদের বঙ্গাস পাঠান নবাবকে পর্যুদস্ত করেন এবং তেত্রিশটি পরগনা নিজের দখলে আনেন। এই কাজটি খুব সহজে হয়নি। ১৭৫০ সালে এর জন্যে সফদর জংকে বঙ্গাস নবাবের কাছে পরাজয় স্বীকার পর্যন্ত করতে হয় এবং এলাহাবাদ দুর্গ দুমাস যাবৎ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পাঠানরা অযোধ্যার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল ও লুঠতরাজ করে। অবশেষে লক্ষ্ণৌর শেখজাদারা তাদের বিতাড়িত করেন এবং সফদর জঙের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। সফদর জং বিপদের মোকাবিলা করতে মারাঠা সেনাপতি মালহার রাও হোলকার, জায়াপপা সিন্ধে এবং জাঠ রাজা সুরজমনেলর শরণাপন্ন হন। শেষপর্যন্ত পাঠান এবং তাঁদের হোহিলা সহযোগীগণকে কুমায়ুন পর্বত পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে যাওয়া হয়, তাঁদের কাছে বিপুল জরিমানা দাবি করা হয় এবং ফারুখাবাদের অর্ধেক তাঁরা মারাঠাদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হন।

মারাঠাদের দিল্লির কাছাকাছি গ্রামগুলি লুঠতরাজ করার সুযোগ দিয়ে তিনি বাদশাহের কাছে আরো সুবিধা আদায় করেন। ১৭৬২ সালে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের সময় দৃশ্যত তিনি ছাড়া এই আক্রমণ প্রতিহত করার কেউ ছিলেন না। পাঠান আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ তিন ১৭৪৯ থেকে ১৭৫২ পর্যন্ত অযোধ্যা ও এলাহাবাদের রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখার অনুমতি লাভ করেন। এই দুই সুবার সমস্ত জায়গীর বাদশাহ উজীরকে অর্পম করেন। এটাওয়া এবং কোরার সমস্ত খাস জমিও সফদর জঙের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে।

সফদর জং ক্রমশ অধীর হয়ে পড়ছিলেন এবং সম্রাটের উপর জাভেদ খানের প্রভাব তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠায় জাভেদ খানতে তিনি হত্যা করেন। এতে সম্রাট শঙ্কিত হয়ে হারেমে আশ্রয় নেন এবং রাজমাতা উধম বাই-এর পরামর্শে তাঁর অপর দুই শত্রু প্রাক্তন উজীরের পুত্র ইন্তিজামুদ্দৌলা এবং ইমাদউল মুল্ক দরবারের তরফে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। এই চাপের মুখে পড়ে সফদলর জংকে উজীর পদ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

মুঘলদের শক্তি বহুদিন যাবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অন্তর্কলহকে তাই শক্তি দখলের লড়াই মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল মুঘলদের নামের মহিমাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগানোর অধিকার

দখলের লড়াই। এই মামের মহিমা আরো শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। সফদর জঙের এর থেকে যতটা লাভবান হবার ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তি পরগাছার মত মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যের উপর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত ১৭৫৩ সালে সন্ধির দ্বারা সফদর জংকে আহমদ শহ অযোধ্যা ও এলাহাবাদের সুবাদার রূপে পুনরায় স্বীকৃতি দেন। সফদর জঙের শক্তির উৎসই ছিল এই প্রদেশগুলি। ১৭৫৩-র পর থেকে কার্যত এই প্রদেশগুলি মুঘল সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নির্বাহ করতে থাকে।

৩৫.৫ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : হায়দরাবাদ

দাক্ষিণাত্য মালভূমির মুঘল শাসিত অংশের নাম ছিল হায়দরাবাদ। মুঘল দুর্বলতা এবং দিল্লিতে অবিরত ষড়যন্ত্রের ফলে এই অঞ্চলে ক্রমাগত শাসকের পরিবর্তন হ'ত। মারাঠাদের অভ্যুত্থানের ফলে দাক্ষিণাত্যে আরো অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এখানকার রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ লাবের জন্য মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্ব চলছিল। এই সুযোগে মুঘল সুবাদার নিজাম-উল-মুল্ক প্রথম আসফজা নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আঞ্চলিক স্তরে স্বশাসিত রাজ্যগঠনের সবরকম প্রক্রিয়াগুলিই ক্রমে ক্রমে হায়দরাবাদে আত্মপ্রকাশ করে। সুবাদারের উপর মুঘল শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। সুবাদার স্বয়ং উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মাধ্যমে সুবাদিরাকে একটি বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণ করেন। আঞ্চলিক রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজকোষে পাঠানো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে প্রাদেশিক স্তরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু হয়। কেন্দ্রীয় রাজধানীর পরিবর্তে প্রাদেশিক শাসক প্রাদেশিক রাজধানীতেই বসবাস করতে থাকেন। এবং প্রাদেশিক শাসকের নামাঙ্কিত মুদ্রা ও তাঁর নামে মসজিদে জুম্মাবারের প্রার্থনাও প্রচলিত হয়।

নিজাম সুবাদার নিযুক্ত হন ১৭১৩ সালে। ১৭২৪ সালে অপর আরেকজন তাঁর পরিবর্তে সুবাদার নিযুক্ত হলে নিজাম তাঁকে পরাস্ত করেন। এই তারিখ থেকেই হায়দরাবাদ দিল্লির অধীনতামুক্ত হয় বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার হায়দরাবাদ স্বাধীন হয়েছে ১৭৪০ থেকে বলে মনে করেন, কারণ এই সময় নিজাম শেষবারের মত উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন। বাদশাহের অনুরোধে বহুবার উত্তর ভারতে গেলেও নিজাম সর্বদাই তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করে যেতেন। তিনি প্রায়ই বাদশাহের অনুমতি ব্যতীতই দাক্ষিণাত্যে ফিরতেন এবং প্রতিবারই মুঘল এবং মারাঠা কর্মচারীদের সরিয়ে তিনি যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছেন তাতে বাদশাহ তাঁকে সুবাদার হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্রমে নিজামের মুঘলদের প্রতি আনুগত্য হয়ে ওঠে নামমাত্র এবং তিনি যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি করা, খেতাব দেয়ো বা মনসবদার নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন।

নিজাম এবং তাঁর উত্তরসূরীদের আমলে মুঘলদের প্রতি আনুগত্যসূচক রীতি-নীতি একে একে বর্জিত হতে থাকে। দিল্লি থেকে ফিরেই নিজাম তাঁর অনুগত রাজকর্মচারীদের নতুন করে তাঁদের পদে বহাল করেন। বাদশাহী মনসবদার থেকে স্বতন্ত্র করে নিজামের নাম অনুসারে এঁরা পরিচিত হন আসফিয়া (Asafia) মনসবদার বলে। ভূমিরাজস্বের হিসাব পরীক্ষা এবং ভূমিস্বত্ব দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত

পুরানো আমলের বাদশাহী দেওয়ান পদটিও ক্রমে লুপ্ত হয়। ১৭৮০ সাল নাগাদ মুঘল ফরমান, খিলাৎ বা মুঘল সালতামামী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হায়দরাবাদের ক্ষমতার উৎস ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের গরিমা। বাদশাহের নামেই মসজিদে খুতবা পড়া হত। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত মুঘলদের নামেই হত মুদ্রাঙ্কন। নতুন কেউ ক্ষমতায় এলে সর্বদাই মুঘল ফরমানের দ্বারা সেই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হ'ত। কাজেই কোন অর্থেই মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন না হয়েও হায়দরাবাদ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক অটুট রেখেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হায়দরাবাদের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হয়। এই সময়ে নিজাম এবং তাঁর প্রধান অমাত্যগণ প্রাচীন মুঘল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ ছেলেড় হায়দরাবাদ শহরে চলে যান এবং রাজসভা ও স্থায়ী শাসনব্যবস্থার পত্তন করেন। ১৭৬২ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত নিজাম আলিখানের দীর্ঘ রাজত্বকালে এইসকল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর আগে নিজামকে দীর্ঘদিন অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। কখনও সংগ্রাম ছিল পশ্চিমে মারাঠাদের সঙ্গে, কখনও দক্ষিণে কর্ণাটকের নবাবির দাবিদার এবং তাদের ইংরেজ বা ফরাসী মিত্রগণের সঙ্গে এবং কখনও কুদ্দাপা, কুর্ণুল, বাসাবর্ণ-বাঁকাপটের পাঠান নবাব বা ডিজিয়ানা গ্রামের রাজার সঙ্গে। অবশেষে ১৭৬০-এর শেষ বছরগুলিতে হায়দরাবাদের সীমারেখাগুলিতে মোটামুটি স্থায়িত্ব আসে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলি পায় প্রথমে ফরাসী এবং পরে ইংরেজরা। কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের আধিপত্য অস্বীকার করেন। সৈনিক হায়দার আলি তাঁর প্রভু মহীশূরের নৃপতির স্থান গ্রহণ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যে, মারাঠাদের সঙ্গে সংগ্রামে মাঝে মাঝে বিরতি থাকে এবং দীর্ঘদিন শান্তিও চলে। হায়দরাবাদের অভহ্যন্তরে নিজামের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংগ্রাম শেষ হয় ১৭৬০-একরক দশমে নিজাম আলি খানের কর্তৃত্বভার গ্রহণের পর। তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে হায়দরাবাদে এমন কতগুলো রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাকে 'হায়দরাবাদী প্রথা' বলে চলে।

এই হায়দরাবাদী প্রথার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এক ধরনের 'দাতা-গ্রহীতা' (patron-client) সম্পর্কের উদ্ভব। অর্থাৎ অভিজাত বা শাসক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সকলেই রাজসভায় তাঁদের এক একজন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র নিয়োগ করতেন, যাঁরা তাঁদের নিয়োগকারীরার স্বার্থরক্ষা করে চলতেন। শাসক বা অভিজাত ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে হায়দরাবাদী রাজনীতিতে অংশ নিতেন।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে একসময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক বা কূটনৈতিক সাফল্য। কিন্তু যখন হায়দরাবাদ ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠল তখন অভিজাতরা হয়ে পড়লেন ভূসম্পদনির্ভর। সবচেয়ে বেশি ভূসম্পদের অধিকারী ছিলেন নিজাম স্বয়ং এবং এর দ্বারা তিন তাঁর সামরি, শাসনতান্ত্রিক ও গার্হস্থ্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। অভিজাতরা তাঁদের সংস্থা (establishment)-গুলি গড়ে তুলতেন নিজামের অনুসরণে। তাঁরাও নগদ অর্থ এবং শাসন সংক্রান্ত পদ বিতরণ করতে সমর্থ ছিলেন। অভিজাতরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে তাঁদের বংশবদদের নিজামের শাসনতন্ত্রে বিশেষ পদ দিতে পারতেন। আত্মীয়, কারিগর, কর্মচারী, কবি এবং ধার্মিক ব্যক্তি ইত্যাদি নানা ধরনের বশংবদ লোকের জন্য

কর্মসংস্থানই ছিল অভিজাত পদমর্যাদার একটা বিশেষ দ্যোতক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে অভিজাতগণের অপচয়বহুল বিলাসীজীবন রাজনৈতিক শক্তির একটা অঙ্গ ছিল।

অনুগৃহীত ব্যক্তিদের পক্ষেও নিজেদের অবস্থা বজায় রাখা এবং অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য এই 'দাতা-গ্রহীতা' ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। দক্ষ কর্মচারীগণ প্রায়ই অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য একজন পৃষ্ঠপোষককে ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষকের শরণাপন্ন হতেন। মারাঠা এবং উত্তর ভারতীয়গমের মধ্যে এই প্রবণতা অধিকতর পরিলক্ষিত হত। নিজামের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ভূক্তিকরণ অনেক সময়েই নির্ভর করত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার উপর। সাধারণ কাজের জন্যও পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজন হ'ত। ব্যক্তিগত সম্পর্কে ভিত্তিতেই পৃষ্ঠপোষকতা অর্জিত হ'ত, জাতি বা আত্মীয়তার দ্বারা নয়। এই কারণেই বেশি সুযোগের আশায় পৃষ্ঠপোষক পরিবর্তন সম্ভব হ'ত।

তদানীন্তন আদবকায়দা অনুসারে নিজামের সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কেউই ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতেন না। পরিবর্তে তাঁরা পাঠাতেন তাঁদের উকিল বা অন্তর্বর্তী ব্যক্তিকে। এই অন্তর্বর্তী ব্যক্তির মাধ্যমেই তাঁরা নিজাম এবং অন্যান্য অভিজাতগণের সঙ্গে তাঁদের বৈষয়িক লেনদেন সম্পাদন করতেন। উকিলদের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে অভিজাতগণ নিজামকে উপঢৌকন পাঠাতেন এবং নিজেদের মধ্যেও প্রীতিজ্ঞাপক উপহার বিনিময় করতেন। উকিলের কূটনৈতিক দক্ষতার ফলে অনেক সময়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হত। পৃষ্ঠপোষকের সংস্থায় কর্মসংস্থানের দ্বারা অনেক উকিল তাঁর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকত্ব অর্জন করতেন।

মারাঠাগণ এবং আর্কটের নবাবেরও হায়দরাবাদের সভায় উকিল ছিল। এই উকিলরা একদিকে তাঁদের প্রভুদের স্বার্থরক্ষা করতেন। অপরদিকে তাঁদের নিজস্ব অশন-ব্যসনও ছিল বিপুল এবং হায়দরাবাদে তাঁদের প্রভুদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরাও বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিয়োগ করতেন এবং মানমর্যায়াদায় তাঁরা নিজামী অভিজাতদের চাইতে কোন অংশেই কম ছিলেন না। নিজাম কখনও কখনও এঁদের জায়গীর দিতেন এবং এঁরা সদলবলে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকগণকে ত্যাগ করে নিজামের অনুগত প্রদায় রূপান্তরিত হতেন। এককালে মুঘল উকিল ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেশোয়া, তাঁর সেনাপতি সিন্ধিয়া ও হোলকার এবং আর্কটের নবাবের উকিলগণ হয়ে ঠেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে অবশ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী উকিল ছিলেন ব্রিটিশ আবাসিক প্রতিনিধি (Resident), যাঁর কাজ ছিল মূঘল ব্রিটিশ উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা।

নিজামের এলাকায় বেশকিছু প্রায় স্বাধীন করদ নৃপতি ছিলেন, যাঁরা বার্ষিক রাজস্বের পরিবর্তে নিজ এলাকা শাসনের অধকারী ছিলেন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সাত-আটটি সংস্থান বা হিন্দু রাজপরিবার। এঁরাও নিজস্ব দরবার এবং অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিমণ্ডলী পরিবৃত ছিলেন এবং শক্তি-সামর্থ্যে এঁরা অন্যান্য অভিজাতবর্গের সঙ্গে তুলনীয় হলেও অন্যান্য অভিজাতগমের সঙ্গে এঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং হায়দরাবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এদের গুরুত্ব ছিল নগণ্য। অধিকাংশ সংস্থানই অবস্থিত ছিল তেলিঙ্গানা অঞ্চলে ; একমাত্র শোলাপুরই ছিল মারাঠাওয়াড়াতে। এই রাজারা সামরিক দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের স্বত্ত্ব লাভ

করেছিলেন পূর্বতন দক্ষিণী শক্তিগুলির কাছে, যথা—বাহমনী সুলতানগণ, বিজয়নগররাজ, পেশোয়া অথবা মুঘল। নিজাম শুধু তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে মহাজন এবং সমরনায়কদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় শাসকদের মত এঁদের কোন পদ ছিল না, কিন্তু এঁরা খুবই প্রয়োজনীয় সামরিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন। তেলেগুভাষী কোমতিগণ ব্যতীত হায়দরাবাদের আর সব মহাজন সম্প্রদায় ছিলেন বহিরাগত। দীর্ঘদিন যাবৎ এঁরা দাক্ষিণাত্যে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। মারওয়ারী, আগরওয়াল, জৈন এবং গোস্বামীরা পশ্চিম ও উত্তর ভারত থেকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হায়দরাবাদে আসেন। অনেকেই আসেন শাল বা র- ব্যবসায়ীরূপে, কিন্তু পরে মহাজনী কারবার শুরু করেন। এক এক জাতির লোক শহরের এক এক অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তাঁদের নিজ নিজ জাতির জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে থাকেন। নিজাম, তাঁর পরিবার এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের ব্যবসায়িক লেনদেন চলত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হায়দরাবাদের আর্থিক সমস্যা জর্জরিত দিনগুলিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সম্পদ হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে সমর অধিনায়ক এবং তাঁদের সেনানীর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। মুঘল সৈন্যবাহিনীর মতই হায়দরাবাদেও কোন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। প্রধান প্রধান অভিজাতগণ নিজামের জন্য সেনাবাহিনী পালন করতেন এবং এই সেনাবাহিনীর জন্য নিজামের কোষাগার থেকে তাঁরা নগদ অর্থ পেতেন। আফগান, আরব, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানে থাকতেন সেই জাতিরই কোন সমরনায়ক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই হায়দরাবাদে ভাড়াটিয়া সৈনিকদের আগমন ঘটতে থাকে।

কয়েকটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সমর অধিনায়কগণ। এই সেনাবাহিনী গঠিত হ'ত দক্ষিণী হিন্দু যোদ্ধা জাতিদের নিয়ে। ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষিত বলে এই সেনাবাহিনীকে বলা হয় 'লাইনওয়ালা'। কর্ণাটকের যুদ্ধে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণের পর থেকেই সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় অধিনায়কের অধীনে শিক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয়। এইসব সমরাধিনায়কগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফরাসী ভাগ্যান্বেষী মশিঁয় রেমণ্ড। এছাড়া বেশকিছু আইরিশ এবং পর্তুগীজ সেনাপতিও হায়দরাবাদের সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

সামরিক অধিনায়কগণ বাস করতেন নগরের প্রান্তে সৈন্যশিবিরে এবং অভিজাতবর্গের সঙ্গে অনেকাংশে মর্যাদায় তুলনীয় হলেও তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল কিছু স্বল্প। রাজনীতিতে এঁদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে সামরিক অধিনায়ক বা মহাজনরা তাঁদের প্রভাব কার্যকরী করতে পারতেন শুধু তাঁদের পরিষেবাগুলি প্রত্যাহারের মাধ্যমে।

দক্ষিণ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সূচনা ঘটে এবং সামরিক শক্তির তুলনায় শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। নিজাম হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ক্রমশ হায়দরাবাদের শাসনব্যবস্থা মুঘল শাসনব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। মুঘল শাসনব্যবস্থার ধারাগুলি অনুসরণ করলেও প্রথমে কিছু কিছু নতুন রীতিনীতির উদ্ভব হয়।

সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ছিল এখানকার কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক দলিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থায়।

নিজাম তাঁর অধীনে একজন হিন্দু বা মুসলমান দেওয়ান নিয়োগ করতেন এবং এই দেওয়নাই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, তালুকদার নিয়োগ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং আর্থিক অনুদান বিতরণ এগুলি সবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। এই ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে অনেক দেওয়ানই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন।

দেওয়ানের পরেই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন নথিপত্রের ভার যাঁদের হাতে ছিল সেই দুই বংশানুক্রমিক দফতরদার। যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ছিল এণদেরই হাতে। ১৭৬০ সালে পূর্বে তেলিঙ্গানা ও পশ্চিমে মারাঠাওয়াড়া দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের জন্য এই পদ দুটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। দেওয়ানের কাছে দায়বদ্ধ হলেও এঁরা স্বাধীনভাবে আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতেন। জায়গীর, ইনাম এবং মনসব এঁরাই প্রদান করতেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত, রাজস্ব সংগ্রহ এবং তার জন্য ইজারাদার নিয়োগ সবই ছিল এণদের দায়িত্ব। দুটি হিন্দু অভিজাত পরিবার এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এবং যাবতীয় দলিল তাঁদের দখলে থাকায় শাসনতন্ত্রে দেওয়ানের ক্ষমতা বেশকিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বলা যেতে পারে।

যে স্বাধীন ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং তার নির্দিষ্ট অংশ রাজকোষে জমা দেবার ভার ছিল তাঁদের বলা হত তালুকদার। রাজস্বের একাংশ ছিল তালুকদারের প্রাপ্য এবং এর বাইরে তাঁরা যা কিছু সংগ্রহ করতে পারতেন তাও থাকত তাঁদের দখলে। তালুকদাররা তাঁদের স্বতন্ত্র হিসাব সংরক্ষণ করতেন। সরকারের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ঘটত দফতরদারদের মাধ্যমে। দফতরদারই তালুকদারদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের এলাকাভুক্ত জমি ও সৈন্য বাবদ প্রাপ্য রাজস্বের হিসেব রাখতেন। মুঘল সাম্রাজ্যেও ইজারাদারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ প্রথা একেবারে অনুপস্থিত না হলেও অবাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু হায়দরাবাদে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ ও গ্রামের হিসাব-নিকাশের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। তালুকদার এবং তাঁর নিচের স্তরে দেশমুখ, দেশপাণ্ডে ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গ্রামগুলির উপর ছিলেন দেশমুখ, দেশপাণ্ডেগণ এবং তাঁরাই গ্রামপর্যায়ের পদাধিকারীদের তরফে তালুকদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন।

হায়দরাবাদেও জায়গীর ছিল, কিন্তু মুঘল জায়গীরদারি প্রথা এখানে কিছু ভিন্ন আকার ধারণ করে। এখানকার জায়গীর ক্রমেই বংশানুক্রমিক হয়ে উঠছিল, মনসবদারদের সংখ্যা যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং তাঁদের বেতনের জন্য জায়গীরের পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছিল। নিজাম বংশানুক্রমিক জায়গীর ভোগদখল অনুমোদন করতেন বলে বহু জায়গীরদার মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে নিজামের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। মুঘলরা দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জয়ের জন্য যেভাবে দক্ষিণী মনসবদারদের যথেচ্ছ জায়গীর প্রদান এবং হস্তান্তর করছিলেন তাতে জায়গীরদারই তাঁদের ক্ষমতা ও সম্পদ সুরক্ষিত করতে এই বিকল্প বেছে নিয়ে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী অন্যান্য ঘটনার অন্যতম ছিল নিঃসন্দেহে।

মনসবদারি প্রথাও হায়দরাবাদে কিছু পরিবর্তিত হয়। মুঘল প্রথায় যেমন সামরিক, অসামরিক নির্বিশেষে সব কর্মচারীকেই জাত ও সওয়ার দুরকম মর্যাদা দেওয়া হত, হায়দরাবাদে সেভাবে অসামরিক কর্মচারীদের কোন সওয়ার মর্যাদা থাকত না। নিম্নস্তরের মনসবদারের ক্ষেত্রে জাত মনসব ছিল কোন একটি বিশেষ এবং চররাচর বংশানুক্রমিক দায়িত্বের জন্য দেয় নির্নিষ্ট বেতনের বিকল্প। নিম্নস্তরে উন্নতির অর্থ ছিল বেশি কাজ এবং তার জন্য বেশি অর্থ, কিন্তু এর জন্য মনসব-এর মান বৃদ্ধি হয়। উচ্চস্তরে মনসব উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেলে কার 'জাত' কত হবে তা অনক সময় পদাধিকারীরর পদ বা বেতনের উপর নির্ভর না করে তাঁর ব্যক্তিগত মানমর্যাদার উপর নির্ভর করত।

মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজামী ব্যবস্থার বড় তফাত ছিল এই যে, নিজামী শাসনব্যবস্থায় 'মনসব' ছিল বিশেষ কোন সম্মানের দ্যোতক বা কোন সামরিক কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ। কিন্তু সাধারণ শাসনতান্ত্রিক পদের সঙ্গে এর কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল না। অতএব অভিজাতবর্গের পদমর্যাদাও 'মনসব' পদের উপর নির্ভর করত না। হায়দরাবাদের শ্রেষ্ঠ দশটি উমরা-ই-আজ্জম পরিবারের 'মনসব' ছিল খুব স্বল্প মর্যাদার। শুধু জায়গীরের পরিমাণ দিয়েও অভিজাতদের প্রাধান্যের পরিমাপ করা দুষ্কর।

অধিকাংশ জায়গীর এবং পদই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ছিল বলে হায়দরাবাদে প্রচুর সংখ্যক বংশানুক্রমিক অভিজাত ছিলেন। সংখ্যায় এঁরা প্রচুর হওয়ার ফলে এংদের মধ্যেকার পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবসময়েই দেখা যেত অভিজাতদের একটা ছোট অংশের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে। দুটি বিষয়ের উপর এই প্রাধান্য নির্ভর করত প্রথমত, সমসাময়িক শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক দায়িত্ব পালন এবং দ্বিতীয়ত, নিজামের সঙ্গে অভিজাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক। দ্বিতীয়টি নির্ভর করত সভার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিজামের কাছে পাওয়া ব্যক্তিগত স্বীকৃতির উপর। এসব ক্ষেত্রে মনসব-এর গুরুত্ব ছিল।

হায়দরাবাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই কোন না কোন সময়ে মুঘল, মারাঠী বা দক্ষিণী সুলতানদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকে সাধারণ পরিবারজাতও ছিলেন। প্রথম নিজামের উচ্চ মনসবদাররা প্রায় সকলেই ছিলেন সমরাধিনায়ক। দু-একজন রাজপুত বা মারাঠা ব্যতীত এঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। রাজপুত বা মুসলমান অভিজাতরা ছিলেন মুঘল আমলের মনসবদার এবং তাঁদের প্রায়ই উত্তর ভারতে জায়গীর থাকত। মারাঠা ওমরাহগণ পূর্বতন দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ বা পেশোয়ার সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে যুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে ও অঞ্চলে নিজামের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা নিজামের পক্ষ অবলম্বন করেন। এরকম একজন ছিলেন বিজাপুরী সুলতানের প্রাক্তন মারাঠা সেনাধ্যক্ষ রাজা রাও রাম্ভা নিম্বালকর। মুঘলদের কাছে সাতহাজারী মনসবের প্রস্তাব পেয়ে তিনি পেশোয়ার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে সমপদমর্যাদায় নিজামের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হায়দরাবাদের বিখ্যাত আরব শিয়া পরিবারের দেওয়ান সালার জং-ও এইরকম একসময় বিজাপুরের কর্মচারী

ছিলেন এবং পরে প্রথমে মুঘল পক্ষে যোগ দেন এবং সেখান থেকে আসেন নিজামের অধীনে।

সমস্থানের শাসকগণও ছিলেন বড় মনসবদার। যুদ্ধজয়ের পরে হায়দরাবাদে স্থিতাবস্থা এলে হায়দরাবাদের সভায় অবস্থান এবং সভার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ আভিজাত্যের একটা বিশেষ চিহ্ন হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় শাসকগণ এবং যেসব সামরিক অধিনায়কগণ গ্রামীণ এলাকায় ভূ স্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরা হায়দরাবাদের নাগরিক জীবনের কার্যকলাপে আর অংশ নিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাধারণ শাসনবিভাগীয় পদ থেকে উচ্চপদে আরূঢ় অভিজাত পদমর্যাদালব্ধ ব্যক্তিগণ প্রথম যুগের অভিজাতদের স্থান গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদে আগত উত্তর ভারতীয় এবং মারাঠা হিন্দুগণ শাসনবিভাগীয় পদগুলি একে একে অধিকার করেন এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ওঠেন।

হায়দরাবাদের দুটি দফতরদার বা হিসাবরক্ষক পরিবারের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই এই ঘটনার ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। দফতর-ই-দিওয়ানীর মহারাষ্ট্রীয় চিতপাবন ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন পাটোয়ারি। একজন ক্ষমতাশালী দেওয়ানের পৃ্ঠপোষকতার ফলে ইনি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভুত উন্নতিলাভ করেন। দফতর-ই-মাল এর প্রতিষ্ঠাতা এক উত্তর ভারতীয় কায়স্থ দাক্ষিণাত্যে আসেন নিজামের ব্যক্তিগত করণিকরূপে। শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন যত বাড়তে থাকে, এইসব হিন্দু শাসকরাও রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন এবং কালক্রমে অভিজাতরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান অভিজাতগণের মধ্যে অনেকজন শিয়াও ছিলেন। মুঘল দরবারি রাজনীতিতে নিজাম-উল-মুল্ক ও তাঁর পিতা তুরানী বা তুর্কী সুন্নি দলের নেতারূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দরী শেষে অনেক মুসলমান অইভজাত পরিবার ছিল ভারতীয় সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই পৈপা (Paipah) পরিবার নিজামের জন্য একটি বিশাল সামরিক বাহিনী তৈরি রেখেছিল। শিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা, দাক্ষিণাত্যের এই দুই পূর্বতন সুলতানের আমলে শিয়াদেরই প্রতিপত্তি ছিল বেসি। এইসব শিয়া পরিবার পরবর্তীকালে হায়দরাবাদে কাজ নেন। দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হায়দরাবাদে পর পর বেশ কয়েকজন শিয়া দেওয়ান পদ লাভ করায় মহীশূর, মাদ্রাজ এবং অযোধ্যা ইত্যাদি যেসব অঞ্চলে ইংরেজরা ক্ষমতায় আসছিল সে সব জায়গা থেকেও শিয়ারা হায়দরাবাদে চলে আসতে থাকে।

কোন একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যথা দায়িত্বপূর্ণ পদ, উচ্চ মনসব কিংবা জায়গীর বা নানাপ্রকার খেতাব অর্জনই যে আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল তা নয়। দেখা যায় যে, হিন্দুরা সচরাচর শাসনতান্ত্রিক পদে থাকতেন এবং তাঁদের মনসব নিম্নমানের হলেও জায়গীরের পরিমাণ হ'ত বৃহৎ ; মুসলমানরা সাধারণত সামরিক পদে থাকতেন এবং পরে বৃহৎ জায়গীর লাভ করতেন। তবে সর্বত্র এই চিত্র এক ছিল না। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই অভিজাত সম্প্রদায় নিজামের সঙ্গে আগত মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় নয়, এ এক নতুনভাবে গঠিত নতুন অভিজাত সম্প্রদায়, যাঁরা গড়ে তোলেন এক নতুন রাজনৈতিক সমাজ।

৩৫.৬ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দী কি শুধুই মুঘলদের পতনের যুগ নাকি এ যুগের কোন স্বতন্ত্র তাৎপর্য ছিল ?

২। অষ্টাদশ শতাব্দী কি মুঘল শাসন এবং ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ ?

৩। বাংলা প্রদেশে দেওয়ান কিভাবে শক্তি বৃধ্বি করে একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনের গোড়াপত্তন করেন তা লিখুন।

৪। অযোধ্যার সুবাদার কিভাবে মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হন ? এ প্রদেশের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য সুবাদারের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক হয় ?

৫। হায়দরাবাদে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয় কিরূপে ? মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এই শাসনের কি কি পার্থক্য ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। মুর্শিদকুলির রাজস্বব্যবস্থা বাংলার জমিদারি প্রথাকে কিভাবে প্রভাবিত করে ?

২। মুর্শিদকুলির রাজস্বব্যবস্থাকে রায়তওয়ারি বলা উচিত কি ?

৩। অযোধ্যার জমিদারদের সম্পদ ও শক্তির উৎস কি ছিল ?

৪। জমিদরা বিদ্রোহ দমনের জন্য অযোধ্যায় কি কি প্রচেষ্টা চালানো হয় ?

৫। ওয়াতন জায়গীর কি ? অযোধ্যায় এই প্রকার জায়গীর প্রদানের কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৬। হায়দরাবাদে নিজামের আমলে মনসবদারি প্রথায় কি কি পরিবর্তন ঘটে ?

৭। হায়দরাবাদের অভিজাতদের সামাজিক পশ্চাৎভমি কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত টীকা :

১। জগৎ শেঠ

২। মুর্শিদকুলির আমলের প্রধান প্রধান জমিদার বংশ।

৩। মুর্শিকুলির বাংলা থেকে জায়গীর স্থানান্তকরণ।

৪। হায়দরাবাদের দফতরদার।

৫। হায়দরাবাদের রাজদরবারে উকিলগণের ভূমিকা।

৬। হায়দরাবাদের মহাজনগোষ্ঠী।

৭। হায়দরাবাদের সামরিক গোষ্ঠী।

৮। সাদাৎ খান ও নাদির শাহ।

৩৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. B. Calkins Philip : *'The Formation of a Regionally Oriented Ruling Group in Bengal',* Journal of Asian Studies, Vol. XXIX, No. 4, August 1970, pp. 799-806.
2. Karim Abdul : *Murshid Quli Khan and his Times,* Dacca, 1963.
3. Sarkar J. N. (ed) : *History of Bengal,* Vol. II, Dacca (1972, Second impression).
4. Barnett B. Richard : *North India between Empires, Awadh, the Mughals and the British* 1720-1801.
5. Alam Muzaffar : *The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Punjab* 1707-1748 (Delhi, 1986).
6. Leonard Karen : *'The Hyderabad Political System and its Participants'*. Journal of Asian Studies, 30, No. 2, May, 1971.
7. Stein Burton : *'Eighteenth Century : Another View'* Studies in History, 5, 1 (1980).